সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

সিরিয়ার গুরুত্ব ও শত্রুপক্ষের স্ট্রাটেজী

সিরিয়া অতি সমৃদ্ধ তার ঐতিহ্য ও ইতিহাসে। আরবী ভাষায় দেশটি “বালাদে শাম” রূপে পরিচিত। মানব ইতিহাসের প্রধান প্রধান সভ্যতার চুড়ান্ত সংঘাতগুলি হয়েছে সিরিয়ায়। সেটি যেমন ইরানীদের সাথে গ্রীক ও রোমানদের,তেমনি খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের। সিরিয়ার ভুমিতেই মুসলমানগণ তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমানদের পরাজিত করে প্রধান বিশ্বশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়। মুসলিম বীর সালাউদ্দিন আয়ুবী এ ভূমিতেই ইউরোপীয় ক্রসেডার বাহিনীকে পরাজিত করে মুসলমানদের হৃতগৌরব উদ্ধার করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে সমুদ্রপথ আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত শত শত বছর ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথগুলো ছিল সিরিয়ার মধ্য দিয়ে। চীন,ইরান,ভারত,ইয়েমেন এবং মধ্য এশিয়ার থেকে বাণিজ্য বহরগুলো সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোতে এসে ইউরোপগামী জাহাজে উঠতো। তেমনি ইউরোপীয় পণ্য এ পথ ধরেই এশিয়ার বাজারে ঢুকতো। ইতিহাসে এ বাণিজ্য-পথ সিল্ক রোড রূপে খ্যাত। রোমান সাম্রাজ্যের রাজস্বের বিশাল ভাগ আসতো এ বাণিজ্য বহর থেকে। এখান থেকেই বিপুল অর্থ জমা হতো উসমানিয়া খেলাফতের অর্থভান্ডারে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় সিরিয়া ছিল অর্থনৈতীক ভাবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। নবীজী(সাঃ)ও বিবি খাদিজা (রাঃ)র বাণিজ্য বহরনিয়ে সিরিয়াতে এসে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

সিরিয়ার উপর দখদারি প্রতিষ্ঠাকে অতীতে প্রতিটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই গুরুত্ব দিত। ইসলামের ইতিহাসেও দেখা গেছে,সিরিয়ার উপর দখলদারিতে যারা সফল হয়েছে তারাই মুসলিম উম্মাহর উপর শাসক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)র রাজনৈতিক শক্তি এবং তার হাতে উমাইয়া রাজবংশ গড়ে উঠার মূল কারণ,সিরিয়ার উপর তাঁর দখলদারি। দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর থাকার কারণে সহজেই তিনি নিজের পক্ষে বিশাল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।সিরিয়ার গুরুত্বও শুধু ভৌগলিক কারণে নয়,রাজনৈতিক,আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় কারণেও। ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম –এ তিনটি প্রধান ধর্মের লালনভূমি হলো সিরিয়া। অপরদিকে আরব জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি যেমন সিরিয়া,তেমনি আরব সোসালিস্টদের কেন্দ্রভূমিও হলো সিরিয়া। তেমনি কেন্দ্রভূমি হলো ইসলামপন্থিদেরও। ইমাম তায়মিয়ার মত মোজ্জাদ্দেদগণ সিরিয়া থেকেই মুসলমানদের পুণর্জাগরণের চেষ্টা করেছিলেন। সালাউদ্দীন আয়ুবী আরব ভূমিকে ইউরোপীয় ক্রসেডারদের থেকে মুক্ত করার যে জিহাদটি শুরু করেছিলেন সেটিও আর কোন মুসলিম ভূমি থেকে হয়নি,শুরু হয়েছিল এ সিরিয়া থেকেই।

1 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সিরিয়া অতীতের ন্যায় আজও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,তেল বা গ্রাসের বিশাল ভাণ্ডার না থাকলেও বিশ্বের মানচিত্রে দেশটির ভৌগলিক অবস্থানটি আজও আগের মতই। তবে দুর্বৃত্তকবলিত বিশ্বে সম্পদশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিপদও অনেক। বাঘ-ভালুকের ন্যায় পশুরা ইঁদুর-বিড়ালের পিছে দৌড়ায় না,দৌড়ায় মোটাতাজা শিকারের পিছনে। বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে দস্যুরা এজন্যই সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশে এসে হাজির হয়। সিরিয়ার মূল বিপদটি এখানেই। এক কালে বাংলাও সমৃদ্ধ ছিল। দিল্লির মোগলদের সবচেয়ে বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হত এ প্রদেশ থেকে। তারই ফল হলো,সমগ্র উপমহাদেশে বাংলাকেই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক শক্তির গ্রাসে পড়তে হয়েছে। তাছাড়া শয়তানি শক্তির শত্রু হিন্দু খৃষ্টান,বৌদ্ধ বা নাস্তিকেরা নয়। এদের এজেণ্ডা সূদ,জুয়া,মদ্যপান,মুর্তিপুজা,অশ্লিলতা ও ব্যভিচারি নির্মূল করে আল্লাহতায়ালার শরিয়ত প্রতিষ্ঠা নয়। বরং শয়তান যা চায় এরাও সেটিই চায়। অথচ মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো শয়তানী শক্তির এজেণ্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের শত্রুতার মাত্রাই ভিন্ন। ভারত,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডাকে সে দেশের ঔপনিবেশিক শাসকেরা টুকরো টুকরো করেনি। কিন্তু সিরিয়াকে ৫ টুকরোয় বিভক্ত করেছে। অথচ ভারত,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার ন্যায় নানা ভাষা,নানা ধর্ম ও নানা বর্ণে বিভক্ত দেশগুলীর বহু প্রদেশ সিরিয়ার চেয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র হওয়ার সামর্থ রাখে।

শুধু সিরিয়া নয়,ঔপনিবেশিক শক্তির কবলে পড়ে কোন মুসলিম ভূগোলই অক্ষত থাকেনি। মধ্যপ্রাচ্যের আজকের ভূগোল যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং গড়া হয়েছে শত্রুদের স্বার্থ পূরণে,সেটি মানচিত্র দেখলেই বুঝা যায়। এসব দেশের ভৌগলিক সীমান্তের কোন ঐতিহাসিক পরিচয় নাই। বিবিসি সংবাদদাতা পিটার ম্যান্সফিল্ড তাঁর বই “The Arabs” য়ে লিখেছেন,কায়রোর এ চায়ের টেবিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক কলমের খোচায় জর্দান নামে এক রাষ্ট্রের জন্ম দেন। অথচ এমন একটি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি যেমন ছিল না,প্রয়োজনও ছিল না। সমগ্র আরব ইতিহাসে সৌদি আরব,জর্দান,কাতার,কুয়েত,ইসরাইল,লেবানন,বাহরাইন দুবাই,আবুধাবি নামে কোন রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু সে রাষ্ট্র নির্মান প্রয়োজন পড়ে এলাকার উপর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি প্রতিষ্ঠা ও সেটিকে স্থায়ীত্ব দেয়ার স্বার্থে। সে লক্ষ্য পুরণে ইসলামের শত্রুপক্ষ সিরিয়াকে ৫ টুকরোয় খন্ডিত করেও খুশি নয়। ষড়যন্ত্র করছে আরো বহু টুকরোয় খন্ডিত করায়। পাশ্চাত্য মিডিয়ায় তেমন বিভক্তির পক্ষে বার বার ওকালতিও করা হচ্ছে। কারণ, দেশটির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধের সামর্থে তারা প্রচণ্ড ভীতু। সিরিয়া একাই ইসরাইলের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ খাড়া করতে সমর্থ। সিরিয়ায় ইসলামি শক্তির বিজয় হলে সে শক্তি যে বিপুল ভাবে বাড়বে সেটি ইসরাইলসহ কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই অজানা নয়। তখন শুরু হবে ইসলামী জনতার লাগাতর জিহাদ। কারণ,সেক্যুলারিস্টদের যুদ্ধের যেমন শুরু আছে,শেষও হাছে। কিন্তু জিহাদ একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। মু’মিনের জীবনে সেটি আমরণের সাথী। জিহাদ থেকে পিছুটান আসে একমাত্র সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে পথভ্রষ্টতায়। জিহাদের সে শক্তি তারা হিজবুল্লাহ এবং হামাসের মাঝে দেখেছে।তবে তাদের ভয়ের কারণ,সিরিয়া হিজবুল্লাহ-প্রভাবিত ক্ষুদ্র দক্ষিণ লেবানন নয়,হামাস-প্রভাবিত ক্ষুদ্র গাজাও নয়।দেশটি আয়োতনে বাংলাদেশের চেয়ে বৃহৎ,লোকসংখ্যা লেবাননের প্রায় ৬ গুণ। প্রায় আড়াই কোটি। তবে দেশটির জন্য দুঃসংবাদ হলো,দেশকে যদি বিদেশী সহায়তায় বিভক্ত করা হয়,তবে সে বিভক্ত টুকরোগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পতাকা নিয়ে বিজয়-উৎসব করার মত ক্ষুদ্র মনের লোকেরও অভাব নেই। যেমন কোন কালেই অভাব হয়নি পাকিস্তান,সূদান,ইরাক,ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন দেশগুলোতে।আরব বিশ্বে হাজার বছরের বেশী কাল ধরে সূন্নী,শিয়া,আলাভী,খৃষ্টান,আরব,কুর্দী,তুর্কমান এরূপ নানা পরিচয় নিয়ে বিচিত্র মানুষের বসবাস। কিন্তু সে পরিচয় নিয়ে কোনদিন পৃথক রাষ্ট্র নির্মানের প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু সেটির প্রচণ্ড প্রয়োজন পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের। ফলে সে পরিচয় নিয়ে সিরিয়া ভেঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মানের পরিকল্পনা নিচ্ছে।

2 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

সাম্রাজ্যবাদীদের কুকর্ম

কোন জাতিকে স্থায়ী ভাবে পঙ্গু বা দুর্বল করার মোক্ষম মাধ্যম রাজনৈতিক দখলদারি বা অর্থনৈতিক শোষন নয়। বরং সেটি ভৌগলিক বিভক্তি। রাজনৈতিক দখলদারি বা অর্থনৈতিক শোষন থেকে দেশকে একদিন মুক্ত করা যায়। কিন্তু ভূগোল বিভক্ত হলে খণ্ডিত দেহের ন্যায় জাতির জীবনে স্থায়ী বিকলাঙ্গতা নেমে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সিরিয়াকে অধিকৃত করার পর দেশকে খণ্ডিত করা হয় পাঁচ টুকরোয়। কারণ তাদের আশংকা ছিল,সিরিয়া অখণ্ডিত থাকলে সেখান থেকেই উদ্ভব হবে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের। জন্ম নিবে আরব ঐক্য। তাছাড়া সিরিয়াকে বিভক্ত করা জরুরী ছিল ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রতিরক্ষাকে নিশ্চিত করার স্বার্থেও। সিরিয়ারই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠা করে ইসরাইল। খণ্ডিত অপর চারটি টুকরা হলোঃ সিরিয়া,লেবানন, জর্দান এবং ফিলিস্তিন। পাঁচ টুকরোয় বিভক্তির পরও ক্ষুদ্র ফিলিস্তিনকে অখণ্ড রাখা হয়নি। এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে বিভক্ত করেছে গাজা ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে। পরবর্তীকালে একই রূপ অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী স্ট্রাটেজীর শিকার হয়েছে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সূদানের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ মুসলিমভূমি। আজ বিভক্ত করা হচ্ছে ইরাককে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষে বিজয়ী শক্তির পক্ষ থেকে সিরিয়ার মূল অংশের উপর দখলদারি দেয়া হয় ফ্রান্সকে। দেশটিতে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর ফান্সের শাসন বলবৎ থাকে। ফ্রান্স তার ২৭ বছরের শাসনে দেশটিতে বহু কুকর্ম রেখে যায়। মুসলমানদের শক্তি হননে ভৌগলিক ভবিভক্তি বা অর্থনৈতিক শোষনের পাশাপাশি তারা বড় ক্ষতিটা করে সেক্যুলারাজিম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে। তারা ভ্রষ্টতা আনে আক্বীদা,চিন্তাচেতনা ও আধ্যাত্মীকতার ক্ষেত্রেও। ভূলিয়ে দেয় জিহাদের ধারণা ও দায়ভার। অথচ জিহাদ হলো মুসলমানদের রাজনৈতীক ও সামরিক প্রতিরক্ষার মূল হাতিয়ার। যেখানে জিহাদ নেই,সেখানে মুসলমানদের রাজনৈতীক ও আদর্শিক প্রতিরক্ষাও নেই। তখন শত্রু শক্তির হাতে মুসলিম দেশ অধিকৃত হয় পূর্ণাঙ্গ ভাবে। তাই নিছক নামায-রোযা,হজ-যাকাতের ফলে মুসলমানদের যেমন প্রতিরক্ষা মেলে না,তেমনি ইসলামের প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ও ঘটে না। বরং যা ঘটে তা হলো, ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে লাগাতর দূরে সরার কাজ। মুসলিম দেশে কাফের ও সেক্যুলারিস্ট শাসনের এটিই হলো সবচেয়ে বিপদজ্জনক কুফল। ফ্রান্সের হাতে সিরিয়ায় সেটাই ঘটেছে।

কোন দেশে ভৌগলিক বিভক্তি টিকসই করার মোক্ষম মাধ্যম হলো সে দেশে জনগণের মাঝে গভীর ঘৃনা এবং সে ঘৃনার ভিত্তিতে ভাতৃঘাতি সংঘাতের জন্ম দেয়া। দখলদার ফ্রান্স প্রশাসন সিরিয়ায় সেটিই করেছে। ফল দাঁড়িয়েছে,হাজার বছরের বেশী কাল ধরে সূন্নী,শিয়া,খৃষ্টান,দ্রুজ,তুর্কমান,কুর্দি সিরিয়াতে একসাথে শান্তিতে বসবাস করলেও ফ্রান্সের মাত্র ২৭ বছরের শাসনে সেটি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘৃনার সে আগুণে অবিরাম জ্বলছে লেবানন,এখন সে আগুণ সিরিয়াতেও ছড়িয়ে দিতে তারা ব্যস্ত। আর সে আগুণের ফেরি করছে ইসলামে অঙ্গিকারশুণ্য সেক্যুলারিস্টগণ। বহু শ্রম ও বহু অর্থে গড়া কোন বিশাল গৃহকে ভস্মিভূত করতে বেশী সময় বা বেশী মাল-মশলা লাগে না। সামান্য পেট্রোল এবং ম্যাচের কাঠিই সে কাজে

3 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

যথেষ্ট। তেমনি বহু শত বছরে গড়া একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংসেও সময় লাগে না। মুসলিম বিশ্বে সে পেট্রোল ও ম্যাচের কাজ দিয়েছে ইসলামে অঙ্গিকারশূণ্য সেক্যুলারিস্ট জাতিয়তাবাদীরা।মুসলিম দেশগুলো ভাঙ্গাতেই তাদের আনন্দ,গড়াতে নয়। তাই মুসলিম দেশগুলো যতই বিভক্ত হচ্ছে ততই বাড়ছে তাদের বিজয়োৎসব। শুধু দিন বা মাসব্যাপী নয়,বছর ব্যাপী।

সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ হলো সূন্নী। শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ আলাভী শিয়া এবং শতকরা ১০ ভাগ খৃষ্টান। অথচ ফরাসীদের শাসনামলে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সংখ্যাগরিষ্ট অফিসার রূপে যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের অধিকাংশই হলো আলাভী শিয়া,এবং পরিকল্পিত ভাবে দূরে রাখা হয় সংখ্যাগরিষ্ট সূন্নীদের। বর্তমান শাসক বাশার আল-আসাদের পিতা হাফিজ আল-আসাদ ছিলেন আলাভী শিয়া,ফলে সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রবেশ ও সেনাবাহিনীতে তার দ্রুত প্রমোশনও সহজ হয়ে যায়। শুধু সিরিয়ায় নয়,সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমুহের সর্বত্র একই কৌশল। সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর শাসন করতে তারা কোয়ালিশন গড়ে সংখ্যালঘুদের সাথে। অধিকৃত বাংলায় একই রূপ কুকর্ম ঘটিয়েছিল ঔপনিবেশিক ইংরেজগণ। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ মুসলমান হলে কি হবে, দেশ শাসনে তারা হিন্দুদের পার্টনার রূপে বেছে নেয়। রাষ্ট্রের পুলিশ ও প্রশাসনের প্রায় ৯৫ ভাগই পূর্ণ করেছিল হিন্দুদের দিয়ে। তাদের হাতে তুলে দেয় দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও জমিদারি। এভাবে মুসলমানদের দরিদ্র ও দুর্বল করা ব্রিটিশ শাসনের মূল নীতি হয়ে দাড়ায়। সিরিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশটিতে ফ্রান্সের নীতি হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানদের দ্রুত দরিদ্র ও দুর্বল করা। সে সাথে শুরু হয় ইসলামি সংস্কৃতি থেকে দ্রুত দূরে সরানোর কাজ। ফলে সিরিয়ার উপকূলীয় নগরী লেবানন দ্রুত পরিণত হয় সমগ্র আরব ভূমিতে মদ্যপান,নাচ-গান,উলঙ্গতা, অশ্লিতা ও ব্যাভিচারের প্রধানতম কেন্দ্রে। ক্যান্সারের ন্যায় এখান থেকেই প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়ায়।

স্বৈরাচারের নাশকতা

স্বৈরাচারি শাসনের নাশকতা স্রেফ গণতন্ত্র হত্যা নয়। বরং বড় নাশকতা হলো দেশবাসীর চরিত্র, মূলবোধ, সংস্কৃতি ও ঈমান ধ্বংস। দেশে স্বৈরাচার যতই দীর্ঘায়ু পায়,ততোই বাড়ে দেশবাসীর পথভ্রষ্টতা। তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে সিরাতুল মোস্তাকীমে চলা।চোর-ডাকাত,সন্ত্রাসী,খুনি ও ব্যাভিচারিগণ ইসালামের প্রচারের বাধা দেয় না। ইসলামের পবিত্র জিহাদকে মৌলবাদী সন্ত্রাস বলে নিষিদ্ধ করেনা। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামী বই বাজেয়াপ্তও করে না। ইসলামের পক্ষের লোকদের উপর লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যাও করে না। কিন্তু বাংলাদেশে বাকশালী স্বৈরাচারিরা অতীতের ন্যায় সেরূপ কুকর্ম আজও করে। মিশরে সেরূপ কাজ করেছিল ফিরাউন ও তার অনুসারিরা। দেশের সকল চোর-ডাকাত ও ব্যাভিচারিদের অপরাধের চেয়েও এসব স্বৈরাচারিদের অপরাধ অধিক। চোর-ডাকাত ও ব্যাভিচারিরা খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও ছিল। কিন্তু তারা ইসলামের তেমন ক্ষতি করতে পারিনি যা করেছে স্বৈরাচারি ইজিদের দুঃশাসন। মুজিবামলে বাংলাদেশ যেরূপ ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়েছিল সেটি দেশের চোরডাকাতদের চুরি বা পতিতাদের জ্বিনার কারণে নয়। বরং স্বৈরাচারি মুজিবের দুঃশাসনের ফলে। আজ ও বাংলাদেশে যে দুর্বৃত্ত শাসন ও সর্বগ্রাসী দূর্নীতি তার বীজ তো সে সময়ই রোপন করা হয়েছিল। চোর-ডাকাত,সন্ত্রাসী,খুনি ও ব্যাভিচারিদের নির্মূল তারা বরং অসম্ভব করে। এ সামাজিক

4 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

দুর্বৃত্তরা কাজ করে স্বৈরাচারের মিত্ররূপে।

হাফিজ আল-আসাদ ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর। তাঁর মৃত্যু হয় ২০০০ সালে। ক্ষমতায় বসানো হয় তাঁর পুত্র বাশার আল-আসাদকে। হাফিজ আল-আসাদ তার তিরিশ বছরের শাসনে মুখে আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও আসল লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার উপর আলাভী শিয়াদের গোত্রীয় শাসনকে সুদৃঢ় করা এবং সে সাথে নিজ পরিবারের রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দেয়া। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আলাভীদের নিয়োগ দেয়া হয়,এবং মৃত্যুর পর নিজ পুত্র বাশারকে পরবর্তী শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেয়। স্বৈরাচারি শাসকগণ কোন শাসনতন্ত্রের ধার ধারে না। কারণ, শাসনতান্ত্রিক শাসন তো নিয়ন্ত্রিত শাসন। সে শাসনে স্বেচ্ছাচারি হওয়ার সুযোগ থাকে না। অথচ স্বৈরাচারি শাসকদের চাওয়া-পাওয়া ও খেয়ালখুশির তো কোন সীমা-সরহাদ থাকে না। শাসনতন্ত্র দ্বারা সে খেয়ালখুশিকে তারা নিয়ন্ত্রিতও করতে চায় না। শাসনতন্ত্র তাদের কাছে বরং গলার রশি মনে হয়। তারা তো চায় নিজেদের উপর নয়,জনগণের উপর নিয়ন্ত্রন। ফলে স্বৈরাচারিরা ক্ষমতা হাতে পেলে শাসনতন্ত্রকে আবর্জনার স্তুপে ফেলে বা ইচ্ছামত সেটিকে কাটছাট করে। সেটি যেমন হিটলার বা আইয়ুবের হাতে হয়েছে,তেমনি মুজিবের হাতেও হয়েছে। সে কাটছাটের মাধ্যমে শেখ মুজির কখনো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন,কখনো বা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন বহুদলীয় গণতন্ত্রকে আস্তাকুঁরে ফেলে একদলীয় বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জনগণ কি চায় সেটিকে কোন মূল্য দেননি।

সিরিয়াতে হাফিয আল আসাদও একটি শাসনতন্ত্র চালু করেছিলেন। তবে সেটির লক্ষ্য শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা বা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ছিল না। বরং মূল লক্ষ্যটি ছিল,আসাদ পরিবারের স্বৈর-শাসনকে বৈধতা দেয়া। পারিবারীক শাসনকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে শাসনতন্ত্রের সাথে মস্করাও কম হয়নি। শাসনতান্ত্রিক বিধি ছিল,প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কিন্তু নিজপু্ত্রের বয়স ছিল ৪০ বছরের কম। শাসনতন্ত্রের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ যেখান বড় সেখানে ব্যক্তিস্বার্থই বিজয়ী হয়। শাসনতান্ত্রিক বিধানকে তখন কবরে যেতে হয়। সিরিয়াতেও সেটি হয়েছে। বয়স কমিয়ে ৩৪শে নামিয়ে আনা হয়। শাসনতন্ত্র জনগণকে কিছু নাগরিক অধিকার দেয়। সে অধিকার হনন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ অপরাধিরা জনগণের শত্রু। দেশের প্রশাসন ও আইন-আদালতের দায়িত্ব হলো জনগণের এমন শত্রুদের শাস্তি দেয়া। জনগণের বিরুদ্ধে এমন অপরাধ করে প্রতিদেশের স্বৈরাচারি শাসকগণ। কিন্তু শাস্তি দানের শাসনতান্ত্রিক বিধানকে নিষ্ক্রিয় করার স্বার্থে শাসনতন্ত্রকেই তারা অকেজো করে। এবং সেটি জরুরী আইনের নামে। তেমনি একটি রাজনৈতীক প্রয়োজনে সিরিয়াতে ১৯৬৩ সালে থেকে ২০১১ সাল -এ দীর্ঘ ৪৮ বছর যাবত জরুরী আইন চালু রাখা
হয়।

5 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

স্বৈরাচারি শাসকগণ শুধু শাসনন্ত্র,আইন-আদালত,প্রশাসন,পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেই নয়,নির্বাচনকেও হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। নিজেদের স্বৈরাচারি রূপকে আড়াল করার জন্য ঘটা করে তারা নির্বাচনেরও আয়োজন করে। পিতার ন্যায় বাশার আল-আসাদও তাই দেশে নির্বাচন দিয়েছেন। সে নির্বাচনে শতকরা ৯৭.২৯ ভাগ ভোটলাভের ব্যবস্থাও করেছেন।ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মি.চার্চিল হিটলারকে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় করেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি নির্বাচনে হেরে গেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকেও তাঁকে নামতে হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারি শাসকের যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনের পড়ে না। দক্ষ সুশাসক হওয়ারও প্রয়োজন পড়েনা। তাদের প্রয়োজন পড়ে স্বৈরাচারে ও ধুর্তামীতে পারদর্শি হওয়া। তাই দুর্ভিক্ষ ও নৈরাজ্যসৃষ্টিকারি মুজিব যেমন ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে সংসদের প্রায় ৯৫% সিট দখল করেছিল,তেমনি বাশার আল আসাদও পেয়েছিল শতকরা ৯৭.২৯ ভাগ ভোট।

সিরিয়ার সেনাবাহিনীর জনবল প্রায় ৪ লাখ। অফিসারদের অধিকাংশই আলাভী,ফলে চলমান বিপ্লব দমনে বাশার পাচ্ছে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের পূর্ণ সমর্থণ। সেনাবাহিনীর মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা নয়,জনগণের জানমালের নিরাপত্তাও নয়। বরং সেটি আসাদ পরিবারের শাসনকে নিরাপত্তা দেয়া। সে লক্ষে জনগণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ কোন ব্যাপারই নয়। অথচ বিপ্লবীদের দমনে সেনাবাহিনী থেকে মিশর,তিউনিসিয়া,ইয়েমেন বা লিবিয়ার স্বৈরাচারি শাসকবর্গ এরূপ সমর্থণ পায়নি। বরং মিশর ও লিবিয়ায় সেনাবাহিনীর বহু সদস্য জনগণের কাতারে নেমে এসছে। ফলে ঐসব দেশে বিপ্লব এতটা রক্তাত্ব হয়নি যা হচ্ছে সিরিয়ায়। দেশটিতে ট্যাংক, দুরপাল্লার কামান,হেলিকপ্টার গানশিপ ও বোমারু বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে নগর ও গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। জনগণের রক্ত ঝরাতে সেনাবাহিনী একটুও পিছুপা হচ্ছে না। জনগণের অর্থে কেনা গুলি ব্যবহৃত হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে। ব্রিটেনভিত্তিক Observatory of Human Rights এর মতে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ অবধি ২৬ হাজার সিরিয়াবাসীর মৃত্যু হয়েছে। দিন দিন এ বিপ্লব আরো রক্তাত্ব হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিন লাখ সিরিয়ান উদ্বাস্তু রূপে আশ্রয় নিয়েছে পাশ্ববর্তী জর্দান, তুরস্ক, লেবানন ও ইরাকে। প্রতিদিন শত শত মাইল পাড়ী দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে হাজার হাজার মানুষ।

শুরু হয়েছে জিহাদ

আরব বিশ্বের নতুন রাজনৈতীক ভূগোল নির্মানের কাজটির শুরু হবে হয়তো সিরিয়া থেকেই। কারণ,আরব বিশ্বে আজ যে বিপ্লব শুরু হয়েছে সেটি প্রথমে শুরু হয়েছিল সিরিয়ার জনগণের দ্বারাই। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের কোরবানী ছিল অনন্য। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদের বিরুদ্ধে করতে গিয়ে একমাত্র হামা নগরীতে প্রাণ দিয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। স্বৈরাচারি হাফিজ আল-আসাদের ট্যাংক বাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছিল এ নগরীর বিশাল অংশ। এ

6 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

কারণেই ইসরাইল ও মার্কিনীদেরও বড় ভয় হলো এই সিরিয়া। ফলে সিরিয়াতে আজ যে বিপ্লব শুরু হয়েছে সেটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে না গিয়ে দিন দিন রক্তাত্ব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চক্র ব্যস্ত দেশটিকে আরো দুর্বল করা নিয়ে। এ বিষয়টি আরব বিশ্বের ইসলামের পক্ষ শক্তি যেমন বুঝে তেমনি ইসলামের শত্রুপক্ষও বুঝে। তাই সিরিয়ার চলমান লড়াইটি আজ আর শুধু সিরিয়ানদের মধ্যে সীমাবন্ধ নেই। জাতিয়তাবাদী যুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট ভূমি থাকে,সে ভূমির নির্দ্দিষ্ট সীমানাও থাকে।কিন্তু জিহাদের সেটি থাকে না। ফলে জিহাদ ূভুছড়িয়ে পড়েছে কাছের ও দূরের বহু আরব এবং অনারব দেশে। অন্য দেশের ইসলামপন্থিরা এ জিহাদের জড়িয়ে পড়ছে।

সিরিয়ার বর্তমান লড়াইটি নিছক রাজনৈতীক সংঘাত নয়। স্রেফ স্বৈরাচারি নির্মূলের লড়াইও নয়।এখানে লড়াই ভাষা,বর্ণ বা ভূমি নিয়ে নয়।এ লড়ায়ে যারা প্রাণ দিচ্ছে তারা সেক্যুলার, সোসালিস্ট বা জাতীয়তাবাদীও নয়। বরং তারা প্রাণ দিচ্ছে ইসলামের বিজয়ের প্রতি গভীর অঙ্গিকার নিয়ে। তারা শুধু বাশারের পতনই চায় না,চায় শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। চায় আরব বিশ্ব এবং সে সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ঐক্য। তাদের সে কথাগুলো আদৌ গোপন নয়। বাশার আলা-আসাদের কাছে যেমন নয়,তেমনি পাশ্চাত্যের কাছেও নয়। ফলে এ বিপ্লব যতই তীব্রতা পাচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে আধিপত্যবাদী ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদীদেরই। দুশ্চিন্তা বাড়ছে সেক্যুলারিস্ট,সোসালিষ্ট ও ন্যাশন্যালিস্টদেরও। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ লড়াই পরিণত হছ্ছে এক নির্ভেজাল জিহাদে। আগুণের তাপে পানির ময়লা খাদ যেমন উপরে ভেসে উঠে,জিহাদও তেমনি আলাদা করে ইসলামে অঙ্গিকারহীনদের। জিহাদের ময়দানে তো তারাই টিকে থাকে যারা লড়াই করে একমাত্র আল্লাহর রাস্তায়। নির্ভেজাল জিহাদে আল্লাহতায়ালা মোজাহিদদের বন্ধু হয়ে যান। ফলে জিহাদ শুরু হলে এবং সে জিহাদে হাজার হাজার মানুষের জানমালের বিণিয়োগ হলে,আল্লাহতায়ালার ফেরেশতারাও তখন সাহায্যে নেমে আসে। পবিত্র কোরআনে এমন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি একবার নয়,বহু বার দেয়া হয়েছে। মোজাহিদ বাহিনীর পরাজয় এজন্যই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ ও তাঁর বাহিনীকে কে হারাবে? সিরায়ার বিপ্লবের এখানেই মূল শক্তি।

জনগণ পরিণত হচ্ছে ড্রোনে

ইসলামের বিপক্ষ শক্তি চায় না সিরিয়াতে স্বৈরাচার বিলুপ্ত হোক। চায় না দেশটিতে ইসলামের পক্ষের শক্তির বিজয়। বাশার আল-আসাদের ইরানের সাথে বন্ধুত্ব নিয়ে তাদের আপত্তি থাকলেও তাঁর সেক্যুলারিস্ট নীতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রেম নিয়ে তারা প্রচণ্ড খুশি। ব্যক্তির ঈমান,চিন্তা-চেতনা এবং সে কোন পক্ষের সেটি ধরা পড়ে তার আচরণ ও সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে। বাশার আল আসাদ,তাঁর বেপর্দা স্ত্রী ও তাঁর পরিবার যে আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে তা ইসলামের নয়,বরং সেটি পাশ্চাত্যের। তাছাড়া সিরিয়ার সেনাবাহিনী কুয়েত থেকে ইরাকী সেনাবাহিনী হটাতে মার্কিন বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধও করেছে।শুধু তাই নয়,আল কায়েদের সদস্য সন্দেহ করে মার্কিনীরা যাদের নানা দেশ থেকে গ্রেফতার করতো তাদের থেকে নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়ায় পাঠানো হতো। মার্কিনীরা এমন কুকর্মকে “রেন্ডিশন” বলে থাকে। রিম্যান্ডে নিয়ে বাংলাদেশের র‌্যাব বা পুলিশ যে নৃশংস কাজটি করে সেটিই সিরিয়ার গোয়েন্দা পুলিশ করতো মার্কিনীদের পক্ষে। এমন এক তাঁবেদার স্বৈরাচারের বদলে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? মিশর,তিউনিসিয়া,লিবিয়া ও

7 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

ইয়েমেনে স্বৈরাচারি শাসনের বিলুপ্তিতে তারা আদৌ খুশি নয়। কারণ তারা ছিল তাদের পরম মিত্র। এসব শাসকদের উপর অর্পিত মূল দায়িত্বটি ছিল পাশ্চাত্যের স্বার্থ সংরক্ষণ। সেটি যেমন সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে,তেমনি সাংস্কৃতিক ময়দানে। পাশ্চাত্য শক্তিসমুহের লক্ষ্য শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য নয়,বরং পাশ্চাত্য মূল্যবোধ,সংস্কৃতি ও জীবনদর্শের বিশ্বব্যাপী ব্যপ্তি। তারা যেমন বিশ্বে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপক্ষ চায় না, তেমনি সাংস্কৃতিক পক্ষও চায় না। অথচ মুসলমানগণ তো তেমনি এক প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া হতে চায়। মুসলমানের সামনে এছাড়া অন্য কোন পথও খোলা রাখা হয়নি। মুসলমান হওয়ার এ এক দায়ব্দ্ধতা। মুসলমানের প্রতিটি কর্ম যেমন ইবাদত,প্রতিটি যুদ্ধই তেমনি জিহাদ। মুসলিম দেশে ইসলামী বিপ্লব এজন্যই তাদের কাছে অসহনীয়। ফলে দেশে দেশে স্রেফ ম্যাকডোনালান্ড বা কেএফসি ফাস্ট ফুডের দোকান খোলা নিয়ে তারা খুশি নয়। তারা চায়,পাশ্চাত্য ঢাঁচে ক্লাব,ক্যাসিনা,নাট্যশালা,মদ্যশালা,পতিতাপল্লি ও সমুদ্রসৈকত গড়ে উঠুক। মাছ যেমন পানিতে বাঁচে,মানুষও তেমনি নিজস্ব সংস্কৃতির মাঝে বাস করে। পাশ্চাত্য দেশের মানুষের পক্ষে এজন্যই পরিপূর্ণ ইসলামি সংস্কৃতির দেশে বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য শক্তিসমুহ তাই শুধু সামরিক ভাবেই আগ্রাসী নয়,ব্যাপক আগ্রাসনটি সাংস্কৃতিক ময়দানেও। সে আগ্রাসন বিস্তারে মুসলিম দেশগুলিতে তারা বিশ্বস্ত পার্টনার চায়। মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরাচারি শাসকগণ ছিল এ কাজে তাদের অতি বিশ্বস্ত পার্টনার। পার্টনারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিশরের হোসনী মোবারক বা তিউনিসিয়ার বিন আলী হিজাবধারি মহিলাদের টেলিভিশনের পর্দায় আসাকেও নিষিদ্ধ করেছিল। অপর দিকে অশ্লিল,উলঙ্গ ও ব্যভিচারি মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল দেশের মদ্যশালা,নাচের ঘর ও সমুদ্র সৈকত। সে সাথে কারারুদ্ধ করেছিল দেশের ইসলামপন্থিদের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা মুসলিম দেশগুলোতে মেরুদ্ণ্ডসম্পন্ন স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়ক চায় না,চায় দক্ষ জেল-প্রশাসক। তারা চায় মুসলিম দেশগুলোকে গড়ে উঠুক বিশাল বিশাল কারাগার রূপে। জেল-প্রশাসকের কাছে কারাগারের প্রতিটি বাসিন্দাই অপরাধী,তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখাই তাদের মূল দায়িত্ব। এখানে অপরাধটি ঈমানদার হওয়ায়। কারণ ব্যক্তির ঈমান বিদেশী দখলদারি বা দুর্বৃত্ত শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা জুগায়। বেঈমান শাসকের কাছে তাই প্রতিটি ঈমানদারই অপরাধী। মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেনের স্বৈরাচারি শাসকেরা সেরূপ কারা-প্রশাসকের দায়িত্বই পালন করতে। বাংলাদেশে সে কাজটিই করছে শেখ হাসিনা।

জেলের মধ্যে প্রতিবাদের অধিকার থাকে না। মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশেও নাগরিকদের সেরূপ অধিকার ছিল না। কিন্তু সে জেলগুলো এখন ভেঙ্গে গেছে,জনগণ নিজ দেশের দখলদারি নিজ হাতে নিয়েছে।ফলে বিপদ বেড়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসরদের। সম্প্রতি মার্কিন ফিল্মে নবীজী(সাঃ)র প্রতি অবমাননা করায় জনগণ আগুন দিচ্ছে মার্কিন,জার্মান ও ব্রিটিশ দূতাবাসগুলোতে। মুসলিম ভূমিতে মার্কিনীরা ড্রোন হামলা করছে,আর এখন মুসলমান নিজেরাই পরিণত হচ্ছে মার্কিন বিরোধী ড্রোনে। শুকনো কাঠের উপর পেট্রোল বিছানো থাকলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটতে কি সময় লাগে? মার্কিনীরা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে যে ঘৃনার পেট্রোল ছড়িয়েছে তাতেই এখন আগুণ লেগেছে। জ্বলে উঠেছে অসংখ্য মুসলিম নগরী। পাশ্চাত্য এতে বিক্ষুব্ধ। মিশর,তিউনিসিয়া,লিবিয়া ও ইয়েমেনের ন্যায় সিরিয়ার জনগণের কারারুদ্ধ দশা বিলুপ্ত হোক পাশ্চাত্য সেটি চায় না। চায় না বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র যাক এবং তারা শক্তিশালী হোক।

8 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

বিজয় অনিবার্য এবং সম্ভাবনা বিশাল

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল,সম্পদও বিশাল। কিন্তু যা নাই তা হলো ইসলামের বিজয়। বিজয়ীর বেশে প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা ইসলামের বিপক্ষ শক্তি। তারা সেবাদাস সাম্রাজ্যবাদী শক্তির। এখানে পরাজয়ের মূল কারণ,মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা।সে ভ্রষ্টতা যেমন নবীজী (সাঃ)র ইসলাম থেকে,তেমনি কোরআনে নির্দেশিত জিহাদ থেকে। এ ভ্রষ্টতা সিরাতুল মোস্তাকীম থেকে। নবীজী (সাঃ)র জীবদ্দশাতে ৫০টির বেশী যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আজ ক’জন মুসলমান জীবনে একটি বারের জন্য রনাঙ্গনে শত্রুর সামনে দাঁড়াচ্ছে? সেটি কি এজন্য যে,মুসলমানগণ আজ শত্রুমুক্ত? কি এজন্য যে,ইসলাম এখন বিজয়ী এবং জিহাদ অহেতুক? অধিকৃত মুসলিম ভূমি কি শুধু কাশ্মীর,ফিলিস্তিন,চেচনিয়া বা আরাকান? বিদেশী বা দেশী শত্রুদের হাতে তো অধিকৃত প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশ। ইসলামের বিজয় তো জায়নামাযে আসে না,আসে জিহাদের ময়দানে। এবং অর্থ ও রক্তের বিনিয়োগে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,“নিশ্চয়ই মু’মিনদের থেকে আল্লাহতায়ালা তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। তারা (ইসলামের শত্রুদের) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়।” -(সুরা তাওবাহ,আয়াত ১১১)। অতএব কারা নিজেদের জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করেছে,আর কারা শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছে সে পরীক্ষাটি হয় জিহাদের ময়দানে। জিহাদ শুরু হলে তো বিজয় আসাও শুরু হয়। এটাই ইতিহাস। কারণ জিহাদ শুরু হওয়ার সাথে আল্লাহর সাহায্য আসাও শুরু হয়।অধিকাংশ মুসলিম দেশে জিহাদ আসেনি বলেই আল্লাহর সাহায্য আসেনি,ফলে বিজয়ও আসেনি।

মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে আশাপ্রদ দিকটি হলো,মুসলমানগণ আবার সে জিহাদের পথে ফিরে আসছে। সে জিহাদ প্রবল ভাবে শুরু হয়েছে সিরিয়ায়। জিহাদের ময়দানে সেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। তারা যেমন অর্থ ও শ্রম দিচ্ছে তেমনি রক্তও দিচ্ছে। জিহাদের কোন ভাষা,দেশ,বর্ণ বা অঞ্চলভিত্তিক সীমান্ত থাকে না। জিহাদ একতা গড়ে সমগ্র দেশ,অঞ্চল,এমনকি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে। আফগানিস্তানের জিহাদ একারণেই শুধু আফগান মুসলমানদের একতাবদ্ধ করেনি,একতাবদ্ধ করেছিল বিশ্বের তাবত মুসলমানদের।আফগান মোজাহিদের পাশে রণাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছিল পাকিস্তানী,আরব,বাংলাদেশী,তুর্ক,চেচেন,চাইনিজ,রোহিঙ্গা ইত্যাদি দেশের মুসলমান। জায়নামাযে যেমন ভেদা-ভেদ থাকে না,এখানেও নাই। একতার সে বলে যোগ হয় আল্লাহর ফেরশতাদের বল। মহান আল্লাহর ফেরেশতা বাহিনী এবং মু’মিনদের বাহিনী তখন একাকার হয়ে যায়। আফগান জিহাদে তাই বিলুপ্তি ঘটেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় বিশ্বশক্তির। মুসলিম বিশ্বের সে সুযোগ এনে দিয়েছে সিরিয়ার মুসলমানদের জিহাদ। ফলে সীমান্ত ভেঙ্গে গেছে সিরিয়ার সাথে তুরস্ক,ইরাক,জর্দান ও লেবাননের সীমান্ত। তাদের জিহাদের সাথে একাত্ম হয়েছে সৌদি আরব, মিশর,কাতার, লিবিয়াসহ আরো বহু মুসলিম দেশের মুসলমান। বিভক্তি তো তখনই শুরু হয় যখন আল্লাহকে খুশি করার বদলে দেশ,ভাষা,বর্ণ,গোত্র –বিভক্তির এরূপ নানা উপকরণ সামনে এসে দাঁড়ায়।

9 / 10

সিরিয়ায় জিহাদ এবং বিশাল সম্ভাবনার পথে মুসলিম বিশ্ব

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 15 September 2012 22:20 - Last Updated Sunday, 23 September 2012 15:47

জিহাদ শুধু আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লড়াই নয়,বরং বিজয় একবার অর্জিত হলে সে বিজয়কে টিকিয়ে রাখার লড়াইও। তবে মুসলিম দেশগুলোতে আজকের জিহাদ হলো অধিকৃত অবস্থা থেকে মুক্তির লড়াই। এমন অধিকৃত রাষ্ট্রে মুসলমানদের মাঝে যদি জিহাদ না থাকে তবে বুঝতে হবে সেদেশে বিশুদ্ধ ইসলামও বেঁচে নাই। ঈমানদার যেমন আজীবনের জন্য ঈমানদার,তেমনি আল্লাহর রাস্তায় মোজাহিদও আজীবনের জন্য মোজাহিদ। তাই মু’মিনের জীবনে জিহাদ শেষ হয় না। সিরিয়ার জিহাদও তাই সিরিয়াতেও শেষ হওয়ার নয়। পুকুরে ঢিল পড়লেও তাতে ঢেউ উঠে,এবং সে ঢেউ তীরে এসে আঘাত হানে। রাজনৈতিক বিপ্লব বা জিহাদ তো ঢেউ তুলে বহু রাষ্ট্র জুড়ে। আরবের বুকে নবীজী(সাঃ) যে জিহাদ শুরু করেছিলেন সেটিই বহু হাজার মাইল দূরের বাংলায় এসে আঘাত হেনেছিল এবং নির্মূল করেছিল পৌত্তলিক শাসন। এবং সেটি তুর্কি মুসলমানদের হাতে। বাঙালী মুসলমানদের বড় অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা যে তারা সে জিহাদকে আর সামনে এগিয়ে নিতে পারিনি। আর প্রতিটি ব্যর্থতাই তো আযাব ডেকে আনে। সে ব্যর্থতার কারণেই তারা শত্রুশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত।এবং আজ চেপে বসেছে দুর্বৃত্ত শাসন।

মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল নয়,বরং তারা তো গড়ে উঠেছে তখন যখন মুসলিম বিশ্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না। তারা গড়ে উঠেছে জিহাদের ময়দান থেকে। মানুষ গড়ার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মীক কারখানা। শত শত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে এ কাজ হয় না। শত শত সুফি খানকাতেও হয় না। বাংলাদেশে যে হয়নি সে প্রমাণ তো বিশাল। আরব বিশ্বের সৌভাগ্য হলো তেমন একটি বিশাল আধ্যাত্মীক কারখানা রাতদিন কাজ করছে সিরিয়ার রণাঙ্গনে। শুরু হয়েছে ইয়েমেন এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। আফগানিস্তানে মোজাহিদরা শুধু সোভিয়েত রাশিয়ার মত বিশ্বশক্তিকেই পরাজিত করেনি,আজ পরাজিত করতে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরও। ত্রাস সৃষ্টি করেছে ভারত,পাকিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার ইসলামের বিপক্ষ শক্তির মনে। প্রশ্ন হলো,আরবের মোজাহিদগণ কি আফগান মোজাহিদদের চেয়েও দুর্বল? আর বাশার আল -আসাদের সরকার কি সোভিয়েত রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী? ফলে সিরিয়ায় জিহাদে বিজয় যে অনিবার্য তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? বরং সম্ভাবনা বিশাল। সেটি মধ্যপ্রাচ্যের শুধু নয়,সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস পাল্টানোর। ১৪/০৯/১২

10 / 10